আমার নাটকের গান দেখা

শৌভিক

নাটকে সঙ্গীতের প্রয়োগ এবং নাটকীয় মুহূর্তকে আরো তুঙ্গস্পর্শী করে তুলতে সঙ্গীতের ব্যবহার দীর্ঘদিনের। ইতিহাসের পাতা না উল্টে আমার অভিজ্ঞতার কথা এই ছোট্ট পরিসরে পাঠকদের জন্য...

আশির দশকে মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে 'ক্লাস থিয়েটার' দলের পানাদা— পঙ্কজদা শুরু করলেন আমাদের নিয়ে ওয়ার্কশপ। আমরা মানে কয়েকজন স্কুল পড়ুয়া নাট্যোৎসাহী। ব্রেশটের অনুবাদ থেকে 'বিধি ও ব্যতিক্রম'। এই নাটকে খাঁড়ামশাই চরিত্রে কাজ করতে গিয়ে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা মঞ্চে নাটকের গানের। 'হরি দিনতো গেল সন্ধে হল পার কর আমারে' গানটি ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হল এই গানটির ভাবার্থ চরম আত্মোৎসর্গের, নিরাসক্তির। অথচ দৃশ্যে খাঁড়ামশাই গানটা গাইছে আর মনে মনে ফন্দি আঁটছে কুলি আর ছড়িদারের বিরুদ্ধে। অতএব গান আর চরিত্র একেবারে দুই বিপরীত মেরুতে। কিন্তু ওইভাবে নাট্যভাবনায় এবং পরিচালকের মুন্সিয়ানায় দৃশ্যটি মনোগ্রাহী হয়েছিল। কারণ অর্থপিশাচ খাঁড়ামশাইয়ের কণ্ঠে ওই গানের ব্যবহার। চরিত্রের মনের ভাব আর মুখের গানের বৈপরীত্যই নাটকীয় উপাদান তৈরি করেছিল। প্রচলিত প্রথার একেবারে উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে দৃশ্যনির্মাণ। নতুনত্ব বইকি!

কুশীলব নাটকের দলে কাজ করতে গিয়ে 'আজকের হযবরল' নাটকটি যখন মঞ্চস্থ করা হয় তখন পরিচালক রুণু চৌধুরী একটি রাজনৈতিক ঘটনাকে মুড়লেন মিউজিক্যালের আঙ্গিকে। সুকুমার রায়ের অমর সৃষ্টিকে নাটকীয় পরিবর্দ্ধন করলেন দলের সদস্য খ্যাতনামা সমাজবিজ্ঞানী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। পার্থদার কলমের সূক্ষ্ম মোচড়ে ধরা পড়ল নব্বই দশকের সংসদের ঘুষ কেলেংকারি। কিন্তু নাটকটি মানুষ পছন্দ করেছিলেন গানের ব্যবহারের জন্য। মেড়ার চরিত্রে অভিনয় করেছিল সাগর রায়। 'হযবরল'-এর ননসেন্স-এর সঙ্গে সমকালীন ঘটনার বুনোট গানে ও নাটকে। পার্থদা যেমন সাবলীলভাবে নাট্যপ্রয়োগ করেছিলেন তেমনি সফল সুরারোপ করেছিলেন সুগত মার্জিত ও পার্থদা। আদ্যন্ত ননসেন্স ভার্সে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগমালা। সেইসময়ে সারা ভারত জুড়ে মুখোরোচক আলোচনা ছিল বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা। সুস্মিতা-ঐশ্বর্যদের কারণে আম-আদমির আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল মিস ইউনিভার্স-মিস ওয়ার্ল্ড। পার্থদা এই নাটকে সেটাকে ব্যবহার করেছিলেন আর সেখানে গানের ব্যবহারটাও যথাযথ। পাঠক জানেন যে এই ধরনের অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে মনোরঞ্জন হিসাবে নাচ-গান থাকে। নাটকে সেই গানটা ছিল, 'রোদে রাখা ইটের পাঁজা, তার উপরে বস্‌ল রাজা'।

মাস্টারপিস সন্দেহ নেই। মঞ্চে তবলা হারমোনিয়াম সহ অনেকগুলো গান ব্যবহার করা হয়েছিল। এবার বলি নাটকটার থিম সঙ্-এর কথা। পার্থদা চাইছিলেন ক্ল্যারিনেটের ব্যবহার করতে। কিন্তু ক্ল্যারিনেটিস্ট ততদিনে প্রায় বিরল। অনেক খোঁজাখুজির পর শেষে দলের এক অভিনেতা খোঁজ দিলেন একজনের। উত্তর কলকাতার গৌরিবাড়ি অঞ্চলে থাকতেন সেই সপ্ততিপর শিল্পী। যাত্রায় বাজিয়েছেন দীর্ঘদিন। সিঙ্গলরিড মাউথপিসে সেই অনবদ্য ফরাসি যন্ত্রে শোনালেন তাঁর বাজনা। তাঁর বাজানো 'ওঠো গো ভারতলক্ষী' ছিল আজকের 'হযবরল' নাটকে থিম সঙ্। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেরার সম্মানে ভূষিত করে নাটকটাকে। দর্শক অবশ্য তার অনেক আগেই তাঁদের রায় জানিয়ে দিয়েছিলেন।

শেকসপিয়ারের 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' নাটকটা বাংলায় মঞ্চস্থ

করার মনস্থ করেছিল 'অভিযান গ্রিনপার্ক'। বাংলা অনুবাদ করেছিলেন দেবীদাস বসু। তাঁর লেখা গান চমৎকার সুর করেছিলেন সংগীত পরিচালক ও আয়োজক মধু মুখোপাধ্যায়। গান রেকর্ড হয়েছিল মধুদারই রেকর্ডিং স্টুডিয়োতে। পাশ্চাত্য সিম্ফনি এবং কান্ট্রি মিউজিকের মিশিলে সুরের অভিনবত্ব ছিল। মধুদার পুত্র জোয়েল মুখার্জী গানগুলি গেয়েছিল। একটা গানের কথা বিশেষ করে বলতেই হবে।

বাসানিও এবং পোর্শিয়ার প্রেমের দৃশ্য। সেখানে গানটা বাসানিওর ঠোঁটে, সেইসঙ্গে নাচ। দিনের পর দিন বহু ঘন্টা রিহার্সাল দিয়ে আমাকে কাজটি তুলতে হয়েছিল। কারণ রেকর্ডেও নতুন গানে লিপ দিয়ে নাচের স্টেপে পা মেলানোর তালিম আমার ছিল না।

এই লেখার উদ্দেশ্য সমালোচনামূলক নয়। আমার নাটকজীবনে যা সঙ্গীতের ব্যবহার হতে দেখেছি তারই কথা লিখলাম।

একদিন নাট্যপরিচালক দেবেশ চট্টোপাধ্যায় বলল মিনার্ভা রেপোর্টারি থিয়েটারে মনোজ মিত্রের একটা নাটক নিয়ে কাজ করছে। রিহার্সাল দেখার আমন্ত্রণ জানাল। মিনার্ভায় গিয়ে দেখি জোর কদমে মহলা চলছে। গানের মহলা। নায়ক সুরকার অভিজিৎ আচার্য গান বাঁধছে আর ছেলেমেয়ের দল কোরিওগ্রাফি অনুশীলন করছে। 'ও দেবী তোর কেমন পা ধূলা লাগে না, ধূলায় গড়া মুরতি ধূলা লাগে না।' দেবেশ গানের দ্বিতীয় অন্তরা লিখছে আর সুরে বাঁধছে অভিজিৎ। লোকগানের শিল্পী অভিজিৎ লোকায়ত গানের মেজাজে সুর বাঁধল। সুরের মাদকতায় গলা মেলালাম সবাই। পরে প্রথম শোতে গিয়ে উক্ত গানটির পূর্ণাঙ্গ রূপ সত্যি দর্শকদের মন কেড়েছিল। এমনকি নাট্যকার মনোজ মিত্র পর্যন্ত অভিভূত। 'দেবী সর্পমস্তা' নাটকটায় গান একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এবং লোকগান আশ্রিত গানগুলি জনপ্রিয় হয় সেইসঙ্গে নাটকটাও।

অভিজিৎ করগুপ্ত রচিত ও নির্দেশিত নাটক 'অন্তঃসলিল'-এর মূলচরিত্র এক সিনেমা পরিচালক এবং এক বাঈজি। বৈশাখী মার্জিত এবং লেখক ছিল দুই চরিত্রে। এই নাটকের গানও খুব যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল। অভিজিতের লেখা গান 'মন রহে না ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে মেঘ আকাশের কোণে... এ তনু যে রবে শুধু তোমারই তরে'— সুর বেঁধেছিলেন মুরারি রায়চৌধুরী। সুগীত, সুখশ্রাব্য শুধু নয় নাটকের ভাবনাটাও বিদ্ধৃত। নথ উতারনা'র দৃশ্যে ব্যবহৃত একটা ঠুংরি— 'হমরি অঠরিয়া পে আ যা রে সাঁওয়ারিয়া'— বাঈজিদের মতন প্রান্তিক মানুষদের যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছিল। বৈশাখীর গান, অভিনয় তারিফ পেয়েছিল দর্শকদের। দুই মূল চরিত্রের নাটকীয় সংঘাতে উন্মোচিত হয়েছিল বাঈজি সমাজের বহু না জানা বিষয়। বাঈজিরা যে সংগীতশিল্পী, দেহপসারিণী নয় তা দেখেছিলেন নাট্যমোদীরা। 'ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি' যে শুধু শিক্ষিত সমাজেরই কুক্ষিগত তার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ ছিল এই নাটকে। সেরা অভিনেত্রীর সম্মান পেয়েছিল বৈশাখী। কিন্তু জানি না কেন সেইভাবে দর্শকধন্য হয়নি 'অন্তঃসলিল'! মনে হয় টপ্পা-ঠুংরি, কালোয়াতি গান তখন কিছুটা কোণঠাসা তথাকথিত বাংলা ব্যান্ডের হর্ষউল্লাসে। বাংলা গানের মূলস্রোতের এই অভিঘাত পড়েছিল বোধহয় এই নাটকটাতেও। আর আমার প্রশ্নটা রয়েই গেল। আধুনিক নাটকে গানের প্রয়োগ বা রূপ ঠিক কীরকম চাইতেন সাধারণ দর্শক? কারণ পরবর্তীকালে 'কুশীলব' প্রযোজিত রুণু চৌধুরী নির্দেশিত নাটক 'সুরের বাঁধনে' উপজীব্য ছিল ঠুংরি শিল্পী নয়না দেবীর জীবন। ছোটি মোতিবাইয়ের চরিত্রে রূপদান করেছিলেন সন্ধ্যা চক্রবর্তী। বর্ষীয়সী সন্ধ্যাদির অভিনয়, গান এবং নাচ একালের নতুন অভিনেত্রীদের শিক্ষণীয়। চরিত্রের অভিনয় এবং ঠুংরির মধুর মোচড় নাটকটাকে সমৃদ্ধ করেছিল। সঙ্গে সুগত মার্জিতের হারমোনিয়াম আর উজ্জ্বল রায়ের তবলা। এক্ষেত্রেও বলা ভালো রুচিশীল দর্শক যারা প্রত্যক্ষ করেছেন নাটকটা তারা বাহবা দিয়েছেন কিন্তু সেভাবে প্রচুর দর্শক সমাগম হয়নি। কেন? সেই প্রশ্নটা তাই আজও রয়েছে আমার মনে যে আধুনিক বাংলা নাটকে সঙ্গীতের সঠিক রূপটা কেমন চাইছেন সাধারণ দর্শক?

সাধারণ দর্শক হিসাবে আমার ভালো লেগেছিল 'পিরিতি পরমনিধি', 'ফ্যাতাড়ু', 'রামনিধি', 'ফুড়ুৎ' নাঠকের গানের ব্যবহার মনোরঞ্জক এবং নাটকের গতির সঙ্গে সুপরিকল্পিত। দেবব্রত বিশ্বাসের জীবনের কোলাজ 'রুদ্ধসংগীত' নাটকের সংগীতের প্রয়োগ সেরকম ছিল না। সঙ্গীতহীনতা নিঃসন্দেহে নাটকটির অন্তরায় বলে মনে করি। তবুও দর্শক দেখেছিলেন দেবশঙ্কর হালদারের অভিনয় গুণেই। নাটকে দৃশ্যান্তরে সংগীতের ব্যবহার নাটকের কারণেই প্রয়োজনীয়। তাই বহু নাটকেই রেকর্ডেও মিউজিক ব্যবহার করা হয়। প্রথমত আর্থিক কারণে। কারণ বাজেট প্রায় থাকে না যন্ত্রশিল্পীদের নিয়ে রেকর্ডিং স্টুডিয়োতে ঢোকার জন্য। অতএব বিভিন্ন শিল্পীদের সৃষ্ট সঙ্গীত থেকে ধার করতেই হয়। এরকমই স্বল্প বাজেটের প্রযোজনা 'সূর্য পোড়া ছাই' নাটকে আমি এবং পরিচালক দেবেশ চট্টোপাধ্যায় মিলে তৈরি করেছিলাম দৃশ্যান্তরের সংগীত। ঋণী থাকতে হয়েছিল পণ্ডিত শিবকুমার শর্মা থেকে কিতারো পর্যন্ত অনেকেরই। কিন্তু দর্শকের ভালো লেগেছিল। নাটকের রসসঞ্চারে বাধা হয়নি।

'কুশীলব' প্রযোজিত 'শতাব্দীর শেষ' নাটকটার কথা লিখেই ইতি টানব। কারণ এই নাটকে শুধুমাত্র একটিই গানের ব্যবহার আছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা 'তখনও ছিল অন্ধকার তখনও ছিল বেলা, হৃদয়পুরের অন্ধকারে চলিতেছিল জটিলতার খেলা।' পার্থ চট্টোপাধ্যায়ই সুর করেছিলেন সেই কবিতায়। প্রবীণ চিত্রশিল্পী ত্রিলোকেশের সঙ্গে হঠাৎ করে এসে পড়া এক সুন্দরী বিজয়লক্ষ্মীর অন্তরঙ্গ মুহূর্ত। নরম আলো আঁধারিতে গানটির সঙ্গে যে দৃশ্য নির্মাণ করেছিলেন পরিচালক রুণু চৌধুরী তা শুধু সমকালীন নয়, নাটকে সংগীতের যথাযথ ব্যবহারের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণও বটে।